ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাস পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯০৩ সাল পর্যন্ত। এরপর ত্রিশের দশকে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যেমন উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য ও চরিত্র ভাবনায় নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন তেমনি বাঙালি জীবনের মনন ও মানসিকতাগুলিকে পাখির ঠোঁটের মতো খুঁটে খুঁটে তুলে আনার চেষ্টা করলেন। আর এখান থেকেই বাংলা উপন্যাসের পরিসর দীর্ঘায়ত হতে শুরু করলো। এর পরের সময়গুলি তো আমরা জানি কীভাবে দেশ ও দশের উপর দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বাঙালি জীবনেও এক একটি বিপর্যয় ও পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেছে। আর এই পরিবর্তন, পরিশোধন ও অবক্ষয়ের সময়গুলিতেই বাংলা সাহিত্যে এক ঝাঁক তরুণ কথাসাহিত্যিক যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগের ধ্বংসস্তূপের বিভূতি গায়ে মেখে এলেন। এই সময় পর্বে আমরা যে সমস্ত লেখকদের পাই তাঁরা হলেন— সমরেশ বসু, গৌরকিশোর ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখেরা। সন্তোষকুমার ঘোষ এই দলেরই একজন অন্যতম বলিষ্ঠ কথাকার ছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যে সময় ও সমাজের দৃষ্টি বদলের, পালাবদলের অগ্নিপরীক্ষার অবক্ষয়ি দিনগুলিই গাঁথা আছে। আমাদের এই অভিসন্দর্ভে সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে বাঙালি জীবনের অবক্ষয়ে সেই দিকটিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

চল্লিশের দশকের উত্তাল পরিস্থিতিতে বাঙালি সমাজ ও জীবন যখন এক এক করে ক্ষয়ে যাচ্ছিলো তখন ঘুণপোকার মতো জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল সেই সময়। লক্ষ করার বিষয় তখন জীবনকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল মন্বন্তরের দিকে কলকাতার রাস্তায় রাখা ডাস্টবিনের আবর্জনার মধ্যে। আবার সমাজকে তার ক্রমশ ভেঙে যাওয়া অসহায়তা, হতাশা, কান্না, ক্ষয়, পক্ষপাত, পঙ্গুত্ব, কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়ার মতো বীভৎসতা গলিয়ে-পচিয়ে দিচ্ছিল। সন্তোষকুমার ঘোষ বাঙালি জীবনের এই অবক্ষয়ের পতন ও পচনকেই চাখতে চাখতে সাহিত্যের আঙিনায় পা দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী পরিবেশে, স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মত্ততা ও উন্মাদনা, মন্বন্তরে ক্ষুধার্ত মানুষদের অসহায়তা, দাঙ্গা ও ধর্ষণে রক্তস্নাত জাতি, দেশভাগের বোবাকান্না করা উদ্বাস্তুদের জীবন যন্ত্রণাতে সন্তোষকুমার ঘোষের শিল্পী চোখ ক্যামেরায় দামি লেন্সের মতো কাজ করেছে, তাই সে সময়ের অবক্ষয়িত জীবন ও সমাজকে এই লেখক কোনোক্রমেই বিস্মৃত হতে পারেননি। কারণ সন্তোষকুমার ঘোষ বেড়েই

উঠেছেন এক অসন্তোষজনক মুহূর্তের মধ্য দিয়ে। তাইতো কথাসাহিত্যে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল একমাত্র মূলধন, বুদ্ধি-বৈদগ্ধ ছিল তাঁর মনের সবচেয়ে ধারালো দিক। লক্ষ করার বিষয় সন্তোষকুমার ঘোষ এমন একজন লেখক যিনি বুদ্ধি দিয়ে জীবন, মৃত্যু, জগত, সংসার, চরিত্র, যৌনতা, প্রেম— এসব দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাইতো তাঁর কথাসাহিত্যের গদ্যের আঙ্গিক ও রীতি এবং শৈলী ভঙ্গিতে এই বুদ্ধিদীপ্ত ফুটে উঠেছে। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকে তীব্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধিচর্চা দিয়ে কথাসাহিত্যে যে ঘরানায় প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁদের অনুসারী, অনুকারী না হলেও কিন্তু তাঁদেরই ঘরানার একজন লেখক ছিলেন। তাইতো তিনি নিছক প্রেম কাহিনি ও রোমান্টিকতামূলক সাহিত্য লিখে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাননি। তিনি যে সাহিত্যের আঙিনায় জাত লেখক হয়ে পা রাখতে এসেছিলেন তা 'কিনু গোয়ালার গলি', 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে' এবং 'কানাকড়ি', 'দ্বিজ'-র মতো উপন্যাস ও গল্পগুলিই তার বড়ো প্রমাণ।

বাস্তব জীবন তথা Real Life-কে বাদ দিয়ে তিনি কখনো সাহিত্যের কাহিনি বুননের কথা ভাবেননি। তাই বলে তাঁর কথাসাহিত্যে আমরা দেখতে পাবো একদিকে দেশে পরাধীন অবস্থার গণ আন্দোলন ও অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের দারিদ্র্য-বেকারত্বের মতো মারাত্মক ইস্যুগুলোকে। তিনি কলম ধরেছেন এমন এক মুহূর্তে যখন সমাজ ও জীবন থেকে মানুষের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, বিবেকবোধের মতো শুভ ধ্যান-ধারণাগুলি হারিয়ে যাচ্ছিলো অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে। তাইতো তাঁর গল্পে কোথাও প্রেম যেমন সার্থক পরিণতি লাভ করেনি তেমনি আবার কোথাও ব্যক্তি-সমাজ-মানুষকে বাদ দিয়ে কল্পনার জগতকে প্রশ্রয় দেননি। আসলে সন্তোষকুমার ঘোষ মনে করেন, Reality-কে, জীবনকে, মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু মনন দিয়ে কোনো সাহিত্য হতে পারে না। আর তাই বলেই তিনি সেদিনের সেই ভেঙেপড়া অর্থনীতি, ক্ষয়ে যাওয়া সমাজকে সাহিত্যের পাতায় তুলে এনেছিলেন। মানুষ পথ চলতে গিয়ে যেমন করে তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব পাল্টে যায়, কীভাবে নাগরিক জীবনের যান্ত্রিক শূন্যতাবোধ গ্রাস করে, কীভাবে দারিদ্র্য-বেকারত্ব মানুষের মূল্যবোধ, সততাকে পিষে দেয়— এসব সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু। আর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সংবাদপত্রের বার্তা সংগ্রাহক হওয়ায় সেই সময়কার সমাজ ও জীবনকে প্রতিদিন খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত জীবনে সন্তোষকুমার ঘোষও শূন্য থেকে

শুরু করা একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। যিনি এক সময় অর্থাভাবে নিজের পড়াশোনা যেমন মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তেমনি আবার খালি পেটে একটিমাত্র পরার জামা সম্বল করে কলেজে গিয়ে মুখ রক্ষা করেছিলেন। মেধা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি পড়াশোনা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কলকাতার রাজপথে চাকরির খোঁজে হেঁটেছিলেন।

আসলে সাহিত্যে যেমন অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি সাহিত্যের ভাষা আসে তেমনি জীবনে অনেক ভাবে পোড়া খেয়ে সত্যিকারের জীবন অভিজ্ঞতা আসে বলেই শিল্পীদের প্রজাপতি ব্রহ্মার সমতুল্য বলা হয়। তাইতো এঁদের কলম তুলিতে থাকে একদিকে সমাজ ও সময়ের ইতিহাস দলিল ও অন্যদিকে থাকে জীবনকে ভাবিয়ে তোলার মতো রসদ। সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্য যেন বাঙালি জীবনের সেদিনের সেই অবক্ষয়ের ইতিহাস দিয়ে সাজানো একটি দলিল। যেখানে সমাজ ও চরিত্র নিয়ে তিনি একটি জাতি ও মানব সমাজের বাঁক বদলের ইতিহাসকে এঁকে গেছেন নিজের হাতে। আমাদের এই অভিসন্দর্ভে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভেবেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি সন্তোষকুমার ঘোষের কোন সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা উত্তাল চল্লিশ পর্বের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছি। তৃতীয় অধ্যায়ে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন যন্ত্রণার বোবাকান্নাকে তাঁর গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে তুলে ধরেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশের শোষিত হাড়-পাঁজর বের করা অর্থনীতি কীভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিকে দারিদ্র্য-বেকারত্বের কবলে ফেলে দিয়েছিল— সেই দিকটিকে তুলে ধরেছি। পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ কীভাবে সমাজের নীতি-বিশ্বাস প্রেমের অবক্ষয় ঘটাল— সেই দিকটিকে আমরা তুলে এনেছি। আমাদের সর্বশেষ অধ্যায়ে আমরা লেখকের গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে তাঁর মৃত্যু চেতনার সুগভীর ভাবনাকে দেখিয়েছি।